দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের মুসলমানদের শ্রেণী বিভাগ ও উপবিভাগ

মুসলমানদের শ্রেনী বিভাগ ও উপবিভাগ (আচার ভিত্তিক)

এ পরিচ্ছেদে আমরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেনীর মুসলমানদের শ্রেনী ও তার উপবিভাগ করায় হব সচেষ্ট। হজরত মহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর পর ইসলামের শরিয়তকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে সাধারনতঃ ধর্মীয় বা আদর্শগত বিভাগ বলা যেতে পারে। ছকের মধ্যে সাজালে মোটামুটি নিম্নরূপ দাঁড়ায়।

আদর্শগত বিভাগ :

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

সুন্নি - শিয়া - মোতাজেলা - খারেজী - রাফেজী - কাদ্রিয়া - কাদিয়ানী

সুন্নি শব্দটা এসেছে সুন্নাতল জামাত থেকে। হজরত মহম্মদ (সঃ) নিজের জীবনে যা করেছেন ও সাহাবীদের অর্থাৎ শিষ্যদের যে কাজ করার জন্য আদেশ করেছেন তার সবগুলোকে সুন্নত বা আবশ্যকীয় কাজ হিসেবে ধরা হয়। কোন কাজ সম্পর্কে সাহাবীদের প্রশ্নে রসুলুল্লাহ্ হাঁ বা না' কিছুই জবাব দেন নি বা সে ক্ষেত্রে তিনি নীরবতা পালন করেছেন তাকেও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত করা হ হয়েছে। অপরদিকে পবিত্র কোরআন শরিফের নির্দেশিত কাজকে অতি আবশ্যকীয় কাজ হিসেবে গন্য করা হয়। হজরত মহম্মদের (সঃ) আদেশ- নির্দেশের সমষ্টি লিখিত গ্রন্থ 'হাদীশ' নামে পরিচিত। পবিত্র কোরআন শরিফ ও হদীশ ইসলাম ধর্মের স্তম্ভ স্বরূপ। প্রকৃত বা খাঁটি মুসলমান উভয় গ্রন্থকে স সম্পূর্নরূপে মেনে চলার চেষ্টা করেন। বগদাদের বাদশাহ হরুন অল্ রসিদ দেশ বিদেশের বড় বড় ধর্মীয় জ্ঞানী-গুনী বা আলেমদের ডেকে ইসলামকে চারটি মজহাবে বিভক্ত করেন। এগুলো হল যথাক্রমে, হানাফি, সাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বেলী। ইসলামী শরিয়তের মধ্যে নানারূপ গন্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে এই বিভাগ গুলোর সৃষ্টি হয়। মজহাব শব্দের অর্থ দল, পথ বা যাত্রাপথ। ধর্মীয় নেতা বা এমামের নামানুসারে মজহাবের নামকরন করা হয়েছে। উপরোক্ত চারটি পথ অনুসরনকারীর সকলেই সুন্নি। সারা ভারতবর্ষে হানাফি ও সাফেয়ী এই দু'মজহাবের মুসলমান দেখা যায়।

ইমাম সাফেয়ীর (রঃ) মতবাদ প্রচারের পূর্বে ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়েছিল। আবু হানিফার শিষ্য বর্গের মধ্যে আব্দুল কাদের মোহাদ্দেস (রঃ) দিল্লীতে আসেন। মোহাদ্দেস শব্দের অর্থ মহা বিদ্যান। তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

সাফেয়ীমতাবলম্বী মুসলমান নিজেদের আহ্লে হদিস বা হদীস-ওয়ালা বলে দাবী করে থাকেন। তারা কোরআন শরীফের নির্দেশ সম্পূর্ণ ভাবে মেনে চলেন অথচ হজরত মহম্মদের (সঃ) বাক্য, ব্যবহার, সমর্থন যোগ্য কাজ বা অনুমোদিত বিষয় তাঁদের কাছে আবশ্যকীয় না হয়ে optional বা ঐচ্ছিক হয়ে পড়েছে। 'যাহারা অপরাপর ঐসলামিক ব্যবস্থার উপরেও শোভন-কর্তব্য পালন, ঘৃন্য ব্যাপার হইতে মুক্তি লাভ এবং যাবতীয় ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করেন আহাদিগকে (ধর্মীয় পরিভাষায়)' মুত্তকী' বা নিষ্ঠা পরায়ন বলে। সত্য পন্থ মুসলমানদের মধ্যে বাহ্যতঃ হনফী, সাফিঈ, হম্বলী মালিকী, সুফী, আহলে হদীস প্রভৃতি নামের যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার পরিকল্পনার ভিত্তি ধর্ম বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতা ও নিষ্ঠাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।' (১)

শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা পবিত্র কোর আন শরীফ বাদে হদীস ও অন্যান্য সাহাবা কেরামগনের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে হজরত আলীর মতামতকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে মেনে চলেন। ইমাম হোসেন ও হজরত আলীর প্রতি তাদের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি লক্ষ্য করা যায়। ইরাকী, মোগল ও পাঠানদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। হজরত মহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর পর মুসলীম সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য জনসাধারন আবুবকর সিদ্দিককে প্রথম খালিফা নির্বাচিত করেন। নির্বাচনের সময় হজরত আলী উপস্থিত ছিলেন না। রসুল্লাহ্ তাঁর জীবীতকালে মাঝে মাঝে হজরত আলীর নাম উল্লেখ করলেও এ সম্পর্কে কোন সঠিক নির্দেশ দিতে পারেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও আবু বকরের নিয়োগ সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। পরবর্তীকালে হজরত আলীর স্বপক্ষীয় দলের মধ্যে বেশীর ভাগই প্রথম তিন খলিফাকে হজরতের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার [illegible] করেন নি। এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব। হজরত আলীর দলভুক্ত লোকদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক শেষ পর্যন্ত তার দল ত্যাগ

খারিজী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। খারিজী শব্দের অর্থ ত্যাগ করা। 'হজরত আলী করমুল্লা আনহুর নেতৃত্বকালের শেষ সময় হইতে খারেজীয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়া দীন ইসলামকে অরাজী করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার পর প্রায় হোসেনের সময় এজিদ দামেস্কের বাদশাহ হইয়া হোসেনের পক্ষ প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তৎপর বিদ্রুব বশতঃ ঐ সময় ক্রমে চারিশত বৎসর মধ্যে দীন ইসলামকে অরাজী দীন অবস্থায় পরিনত করিল।' (২) রাফেজী সম্প্রদায় পবিত্র কোরান শরিফের সমুদায় বিধি বা নির্দেশ মেনে চলে না। আবার কাদরিয়া সম্প্রদায় তাপ্যকে স্বীকার করতে নারাজ। ইসলাম ধর্মে তকদীর বা তাপ্যকে অস্বীকার করার কথা নয়। গোলাম আহম্মদ কাদিয়ান থেকে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। আরবী শাবান মাসের ১৫ই রাত্রে 'সবে বরাত'। এই রাত্রেক অনেক ভাগ্যের রাত বলে মনে করেন।

'আগামী এক বৎসরের হায়াত, মউত, রেজেক দৌলত ইত্যাদি সম্পর্কীয় তকদীর ও কিসমত এই রাত্রিতে আল্লাহুর তরফ হইতে লিখিত হইয়া ফেরেশতাদের হাওলা করা হয়'। (৩) শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার অনেকগুলো ভাগ লক্ষ্য করা যায়। 'ইসমাইলি সৈয়দ ইমাম জাফর আলি সাদিক ছিলেন হজরত মহম্মদের বংশধর। তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ইমাম। ইসমাইল ও মুসা নামে তাহার দুই পুত্র ছিল। পিতার জীবদ্দশায় ইসমাইল মারা যান। উত্তরাধিকার-সূত্রে মুসা সপ্তম ইমাম নিযুক্ত হওয়ায় ঐ সম্প্রদায়ের একদল প্রতিবাদ জানাইলেন। কেন না, একমাত্র প্রথম পুত্রেরই উত্তরাধিকার সূত্রে ইমাম হইবার অধিকার আছে। দ্বিতীয় পুত্র মুসার ইমাম হওয়া অবৈধ। তাহারা দাবি করিলেন যে,মৃত ইসমাইলের বালক পুত্রই ইমাম পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।শিয়া সম্প্রদায়ের এই দলকে বলা হয় ইসমাইলি। এই সম্প্রদায় দুই দলে বিভক্ত। প্রথম দলের ইমাম আগা খাঁ এবং দ্বিতীয় দল বোম্বাইয়ের সৈয়দ তাহির সৈফুদ্দিনের অনুগামী।' (৪) সাফেয়ী ও আহলে হদীস মতাবলম্বীদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের লামজহাবী বলে থাকেন। এঁরা চারটি বিশিষ্ট মজহাবের কোনটিকে ও মেনে চলতে রাজী নন। ইসলামের শুরুতেই যখন কোন মজহাব ছিল না তখন ইচ্ছে করে তাঁরাই বা এগুলোকে গুরুত্ব দিবেন কেন?

'হজরত গওসল আজম বড়পীর সাহেবের সময়ে এবং তার পূর্বে কতকগুলি না - মজহাবী এবং বেদআত বাদীদের ভেজাল দেওয়ার ফলে ধর্মীয় আচার ব্যবহার ক্রিয়া - কলাপের মধ্যে গোলমাল বেঁধে গিয়েছিল আর বড় পীর সাহেব মারফৎ তার পূর্ণ সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন বিশ্ব আধিপতি আল্লাহ। তারপর থেকে যে গোলমাল চলছিল এবং এখনও চলছে। মাঝে মাঝে কোন কোন মোজাদ্দেদ আগমন এসে কিছু কিছু সংশো - ধন করেছেন বটে, তবে সম্পূর্ণ পারেন নাই।' (৫) কাদিয়ানী মুসলমান সম্প্রদায় আহমদিয়া নামেও পরিচিত। ~~xxxxxxxxxxxx~~ ''ধর্মগুরু মীর্জা গোলাম আহমদের ভক্তবৃন্দকে আহমদিয়া বলা হয়। মীর্জা গোলাম আহমদ দাবী করেন তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ত্রানকর্তা যাহার সম্পর্কে হাদিসে উল্লেখ আছে। আহমদিয়া দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একদল মীর্জা গোলাম আহম্মদকে পয়গম্বর বলিয়া মানে। তাহারা অন্যান্য মুসলমানের সহিত একত্রে নামাজ পড়ে না। এই সম্প্রদায়ের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান। সেইজন্য ইহাদিগকে কাদিয়ানীও বলা হয়। অপর সম্প্রদায় গোলাম মহম্মদকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার ~~xxxxx~~ করে না। তাহারা শুধু জানে যে, তিনি ধর্মসংস্কারক। ইহারা অন্যান্য মুসলমানের সহিত নামাজ পড়ে। লাহোর এই সম্প্রদায়ের কর্মকেন্দ্র। (৬) মুসলমানদের মধ্যে শিয়া ও সুন্নির মতো আর একটি শাখা লক্ষ্য করা যায়। তার নাম ওয়াহাবী। ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অষ্টাদশ শতাব্দীর মহম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব (ইবন মৌদওয়াহাবী)। ওহাবী শব্দটা এসেছে আরবী শব্দ ওহাবুন থেকে। এরা কোরান হদী শরীফ স্বীকার ~~x~~ করলেও অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছামত চলে। হানাফি মজহাব থেকে আবার শিক্ষাগত মতানৈক্যের জন্য বেরেলবী, দেওবন্দী, মওদুদী প্রভৃতি সতেরটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। হানাফী বেরেলবী সম্প্রদায় পীর-দরবেশদের (সুফী) মতবাদকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অথচ হানাফি দেওবন্দী সম্প্রদায় পীর দরবেশদের শ্রদ্ধা করলেও বেরেলবীর মতো গুরুবাদে বিশ্বাসী নন। বেরেলবীর গুরুবাদ শেষ পর্যন্ত পীরপূজায় এসে দাঁড়িয়েছে। পীর বোজর্গগণ খোদার নৈকট্যলাভের জন্য চারটি বিষয়ের উপরে অত্যধিক জোর দিয়ে থাকেন। এগুলো হল শরিয়ত (উপদেশপূর্ণ সৎকথা), তরিকত (উপদেশপূর্ণ সৎকথাকে মনে নিয়ে কার্যে পরিণত করা), হকিকত (কোন কিছুর বা বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বুঝে নেওয়া) ও মারেফাৎ (কোন বিষয়ের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করা ও অবগত হওয়া) পীরের অর্থ জেন্দা বা জীবিত। তার শিষ্য মুরিদ নামে পরিচিত। মুরিদের অর্থ মোর্দা বা মৃত।'' হজরত আলীর সম্পূর্ণ নাম আলী বেন আবু তালিব - হজরত মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। সুফীগণ তাঁহাকে আধ্যাত্মিকতার শীর্ষস্থান দিয়া থাকেন

এবং ইসলাম ধর্মতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত বলিয়া গণ্য করেন যদিও সর্বসম্মতি ক্রমে আলী চতুর্থ খালিফা নির্বাচিত হন (৬৫৬ খ্রীঃ) । (৭)

'আরবদের মধ্যে উদ্ভূত প্রাথমিক যুগের কৃচ্ছতা ও সাধনামূলক সূফী মতবাদ, ধীরে ধীরে সংসার বিতৃষ্ণতা ও পূর্ণ বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া যখন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পারস্যে পৌঁছিয়া Pantheism বা বিশ্বব্রহ্মবাদ অথবা সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মবাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল প্রকৃত পক্ষে তাহার না হইলেও ঠিক সেই সময়ের পরবর্তী একটি ধারা ভারতে প্রবেশ করে এবং অনতিবিলম্বেই ভারতের পশ্চিম প্রান্তকে বিধৌত ও প্লাবিত করিয়া তাহারই একটি শাখা প্রবাহ চিরদিনের অবগুন্ঠিত বাঙালাকে প্লাবিত করিবার জন্য এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অর্থাৎ বঙ্গে মুসলমান অধিকার সূচনার পূর্ব হইতেই বঙ্গে সূফী প্রভাব পড়িতে থাকে।' (৮)

'যেমন একদিন দেশের সর্বত্র বৈষ্ণব, আউল, বাউল, সাঁই প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আখড়া প্রতিষ্ঠা, তেমনি অন্যদিকে অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান ধর্মপ্রচার এবং মসজিদ, মক্তব ও মুসলমান সাধকদের আস্তানাহ ও দরগাহ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা। ধর্মান্ধ ও গোঁড়া বিজেতৃগণের আপ্রাণ চেষ্টা যেখানে নিতান্তই ব্যর্থ ও নিষ্ফল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে মুসলমান সাধকদের উদারতার ও শান্ত প্রবর্তনা সেখানে আশ্চর্যরূপে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। সকল স্তর ও সকল সম্প্রদায়ের সহিত অবাধ মিলনের দ্বারা বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে এই মুসলমান সাধকগণ যোগসূত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।' (৯)

মুসলমান সাধকগণ খোদার নৈকট্য লাভের বিভিন্ন তরিকা বা পদ্ধতি অবলম্বন করে থেকেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী সাধকদের শিষ্যবর্গ (১) কাদেরিয়া (২) চিশতিয়া (৩) নক্সেবন্দিয়া ও (৪) মোজাদ্দাদিয়া এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। নবীগন ও সাধকগণ ঐশ্বরিক বা দৈবশক্তি বলে নানারকম অলৌকিক ঘটনা কিংবা আশ্চর্য ঘটনা প্রদর্শন করতে পারতেন। এইরূপ বিদ্যাকে গুপ্তবিদ্যা নামে অভিহিত করাই শ্রেয়। মুসলমানদের কাছে এটা মোজেজা ও কেরামতি নামে পরিচিত। নবীগন মোজেজা ও সাধকগণ কেরামতির অধিকারী ছিলেন। '' যাদুবিদ্যা, ভোজবাজি বা ম্যাজিককেই সাধারণ অর্থে ইন্দ্রজাল বলা হয়। ব্যাপক অর্থে ইহা হস্তকৌশল। যান্ত্রিক কৌশল, ঔষধপত্র, প্রখরবুদ্ধি, মনঃশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির এক বা সম্মিলিত প্রয়োগ দ্বারা অদ্ভুত বা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন। অতিপ্রাচীন কাল হইতেই ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রচলন। মিশরীয় দেশের ধর্মযাজকগণ, রোমের পুরোহিতগণ, ভারতের প্রাচীন মুনি ঋষি ও সন্ন্যাসীগন এই বিদ্যা নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাকে

ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া প্রাচীনকালের পুরোহিত, ধর্মযাজক এবং সন্ন্যাসীগণ নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী সম্রাট অপেক্ষাও অধিক দৈব ক্ষমতাশালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যার প্রচলন করিয়াছিলেন। তাহারা ইহাকে গুপ্তবিদ্যা হিসাবে অনুসরন করিতেন এবং গুরু হইতে শিষ্য পরম্পরায় ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিত।' (১০) অথচ মুসলমানেরা মোজেজা ও কেরামতিকে ইন্দ্রজাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী বলে মনে করেন কারন এই অধিক শক্তির উৎস স্বয়ং আল্লাহ।

'হে মানবমণ্ডলী তোমরা তাদেরকে মোর্দা বলো না, যারা যে সমস্ত লোক আমার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্য আত্মবলী দিয়েছে। অর্থাৎ নাফসানিয়াৎ (রিপুচয়ের স্বাভাবিক শক্তি ও প্রভাবকে) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করতঃ আমারই নির্দেশিত আদেশ ও উপদেশগুলিকে মেনে নিয়ে আমারই প্রেমে আত্মনিবেদন করতঃ মারা গিয়েছে। কিন্তু তারা সত্যিকারের মোর্দা নয় বরং তারা কেবল তোমাদের চর্মচক্ষুর দৃষ্টির অন্তরাল হয়েছে মাত্র।' (১১) ~~(জ্ঞানের আলো ৩য় ভাগ পৃঃ ১০ সৈয়দ আব্দুর রউফ আল হোসায়নী)~~ ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী আচার ব্যবহার ও গুনের দিকে লক্ষ্য রেখে মুসলমানদের সাধারনতঃ তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যায় যথা (১) আশরাফ কৌম (শিক্ষিত ও সভ্য সম্প্রদায়) (২) আতরাফ কৌম (অর্ধ সভ্য সম্প্রদায়) ও (৩) আরজাল বা রাজিল কৌম (অসভ্য ও বর্বর সম্প্রদায়) কোন নবী এবং আল্লাহর অলীর বংশধর বা আওলাদ আশরাফ কৌমের অন্তর্ভুক্ত।

শেখ সৈয়দ মোগল ও পাঠান এইভাবেই আমরা মুসলমানদের শ্রেনী বিভাগ করে থাকি। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের বংশধর বা আওলাদ সৈয়দ নামে পরিচিত। শেখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ও আবার কতকগুলো ভাগ দেখা যায় যেমন (১) শেখ সিদ্দিকী (আবুবকর সিদ্দিকের বংশধর) (২) শেখ ফারুকী (উমর ফারুকের বংশধর) (৩) শেখ আলুবী (হজরত আলী হজরত ফাতেমার মৃত্যুর পর কয়েকটি বিবাহ করেছিলেন। তাদের গর্ভজাত সন্তানগনের নাম আলুবী) ও (৪) শেখ আব্বাসী (হজরত মহম্মদ (সঃ) এর কাকা হজরত আব্বাসের বংশধর) মুসলমানদের শেখ ও সৈয়দ শ্রেনী বিভাগটা মোটামুটি স বংশধরগত। আর মোগল ও পাঠানরা যে কার বংশধর তা বলা মুস্কিল তবে কেউ কেউ অনুমান করেন যে তারা কোন আনসার বা মোহাজেরীনদের বংশধর।

(৫) সাধারন বা রেওয়াজী - আমাদের দেশের অনেকগুলো মুসলমান নিজেদের নামের আগে শেখ লেখে থাকেন কিন্তু ঐদের বংশের কোন লিখিত দলিল বা প্রমান পাওয়া যায় নি।

'হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কিছু প্রভাব মুসলমান সমাজে দেখা যায়। কারন বাংলার মুসলমান সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেনীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সৈয়দ (অর্থাৎ যাহারা হজরত মুহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবী করেন) আলিম (পন্ডিত ও শিক্ষাব্রতী) শেখ (পীর) ছিলেন উচ্চ শ্রেনীভুক্ত এবং বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। কাজী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মোল্লারা ও জনসাধারন অপেক্ষা কিছু উচ্চস্তরের ছিল। ইহা ছাড়া তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতি ও বিভিন্ন শ্রেনীর বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এই শ্রেনী বিভাগ হিন্দুদের জাতিভেদের ন্যায় কঠোর ছিল না - ইহাদের মধ্যে পানভোজনের বা স্পর্শ দোষের বালাই ছিল না এবং বিভিন্ন শ্রেনীর মধ্যে বিবাহাদি ও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।' (১২) বৃত্তি বা পেশাগত বিভাগ - এই বিভাগগুলো নিম্ন শ্রেনীভুক্ত মুসলমানদের মধ্যে বেশী দেখা যায়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম শুমারীর বিবরনে দেখা যায় এই দেশীয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে শেখ ও সৈয়দ, মোগল ও পাঠান প্রভৃতি ক্ষুদ্রবৃহৎ আশি প্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকদের সংখ্যা ও তাহার জাতি নিরূপন করিয়াছেন। (১৩) এগুলো হল যথাক্রমে (১) আবাদাল (২) আজলাফ (৩) আমুশিজ (৪) বেদিয়া (৫) বেহারা (৬) বেলদার (৭) ভাট (৮) ভাটিয়া (৯) চাটুয়া (১০) চুরিহরা (১১) দফাদার (১২) দাই (১৩) দর্জি (১৪) দেওয়ান (১৫) ধাওয়া (১৬) ধোবা (১৭) ধুনিয়া বা ধুনকা (১৮) ফকির (১৯) গাইন (২০) হাজ্জাম (২১) জোলা (২২) কাগাজি (২৩) কালান (২৪) কান (২৫) কাসুবি (২৬) কসাই (২৭) কাজি (২৮) খাঁ (২৯) খোন্দকার (৩০) কলু (৩১) কুমার (৩২) কুঁজরা (৩৩) লালবেগী (৩৪) মাহিফরুল (৩৫) মাহিমল (৩৬) মাল্লাহ (৩৭) মল্লিক (৩৮) মসালচি (৩৯) মেহতর (৪০) মীর (৪১) মির্জা (৪২) মুচি (৪৩) মোগল (৪৪) নর্চি (৪৫) নলিয়া বা নলুয়া (৪৬) নাসাস্যা (৪৭) নাট (৪৮) নিকারী (৪৯) পাঠান (৫০) পাওয়ারিয়া (৫১) পীর কোদালী (৫২) রাসুয়া (৫৩) সৈয়দ (৫৪) শেখ (৫৫) সোনার।

<u>অন্যান্য মুজাতি :-</u>

(১) আফগান (২) আশরাফ (৩) বাকলি (৪) বাখো (৫) বাড়ি (৬) ভূঁইয়া (৭) চৌধুরী (৮) চুনারী (৯) দফালি (১০) গাড়ি (১১) গোলাম (১২) হালালখোর (১৩) হিজরা (১৪) হোসেনী (১৫) খরাদি (১৬) কোরেশী (১৭) লাহেরী (১৮) মাৎটা (১৯) মেহানা (২০) মীরদেহ্ (২১) মিরিয়াসিন (২২) মিঞা (২৩) নও মোসলেম (২৪) পাটৈয়া (২৫) মুন্সি -(১৪) ' নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে অনেক শ্রেণীবিভাগ ছিল। যথা - গোলা, জোলা, মুকেরি, কার্মাড়ি, সানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজী, শিকারি, দরজি, বেলটা, রংরেজ, হালাল ও কসাই।' - (১৫) 'অধুনা মুসলমানের জাতিভেদ নয় বরং পেশা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ।' মোল্লা নামে আর একটি নূতন যাজক শ্রেণীর আবির্ভাব ও উল্লেখযোগ্য। ইহারা হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রাম-বাসীর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান এবং বিবাহাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত করিত। লোকের গলায় পুঁতি ঝুলাইয়া তাদের ভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত এবং [সেই] সঙ্গে কসাইয়ের বা ব্যবসা অর্থাৎ মুরগী, বকরী ইত্যাদি জবাই করিত। এই সমুদয় হইতে যে অর্থলাভ হইত, তাহাই ছিল তাহাদের উপজীব্য'। - (১৬)

আগেকার দিনে লোকের নামের আগে বা শেষে পেশাভিত্তিক উপাধি যোগ করা থাকত। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও শিক্ষার প্রসারের ফলে পেশা পরিবর্তিত [হওয়ায়] মোল্লার বংশধরেরা কেউ সৈয়দ কেউ পাঠান হয়ে বসে আছে। নিজেদের খোয়ালখুশী মতো পদবী যোগকরায় তাদের আসল পরিচয় উদ্ধার করা আজকের দিনে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। পবিত্র কোরান শরিফ ও হাদীসে মুসলমানদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে (১) খাঁটি মুসলমান - এঁরা কোরান হাদীসের নিয়ম নীতি অনু-যায়ী নিজেদের জীবন কাটিয়ে থাকে। (২) মুনাফেক - এঁরা ইসলামী শরিয়ত হিসাবে কাজ করলেও অনেক ক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে বহু দেব বাদ বা শক্তিতে বিশ্বাসী ! (৩) মোশরেক - এই শ্রেণীর মুসলমানকে শুধু নামের মুসলমান বলা হয়। কেউ কেউ এঁদের বাহ্যিক মুসলমানও বলে থাকেন। কারণ অন্তরে তারা অন্য ধর্মকে ভালবাসে।

'পূর্ব আফগানিস্থানের পশতো ভাষী ওয়াজিরি আফ্রিদি ইত্যাদি কাবুল উপত্যকার কাফিরিস্তানভুক্ত উপজাতি পাঠান নামে পরিচিত। মধ্যাঞ্চলের হাজারাপন্থন মোঙ্গল মহাজাতি হইতে উদ্ভূত। উত্তর আফগানিস্থানের বাল্খ, শিবারঘান, কাটাঘান ও মৈমানা অঞ্চলের তুরানী ভাষী তুর্কজাতিভুক্ত। পশ্চিম আফগানিস্থানের তাজিকরা পারসী ভাষী।[2](১৭) মুসলমান যাজক শ্রেণীর মধ্যে আবার ভাগ দেখা যায়। (১) কাটমোল্লা (২) মোল্লা (৩) মুন্সী (৪) মৌলবী (৫) মৌলানা। এরা সকলেই সমাজে নিজেদের একটা স্থান করে নিয়েছে। বিশেষ করে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। মৌলানার স্থান সকলের উর্ধে আর কাটমোল্লা একবারে নিম্ন পর্য্যায়ে পড়ে। ধর্মীয় ব্যাপারে কাটমোল্লাও মোল্লার জ্ঞান অতি অল্প। ফাতেহা করা কাটমোল্লা ও মোল্লার অন্যতম কাজ। হিন্দুঠাকুরেরা যে ভাবে নৈবেদ্য ও অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজা করে ফাতেহার ব্যাপারটাও খানিকটা অনুরূপ। শ্রী কালীপদ লাহিড়ী তাঁর 'গৌড় ও পাণ্ডুয়া' বই খানিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে জোলা, মুকেরী, পাটারী, কাবারী, গরুমাল ; সানাকর, উরকর, কাগজী, ও কলুদের নাম উল্লেখ করেছেন। 'গৌড়ের নিকটবর্তী যে সকল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহন করিয়াছিল। তাহারা আজও জোলা (তাঁতি) ধুনিয়া, মহীফরাস, সবজিফরাস প্রভৃতি নামে পরিচিত'। (১৮)

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলায় বংশ ও পেশাভিত্তিক যে সকল মুসলমান শ্রেণী রয়েছে তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত xxxx বলে মনে করি। ১) আবাদাল বা আবদাল - আল্লাহর ওলির একটা উচ্চস্তরভুক্ত এই আবাদাল। পৃথিবীর মধ্যে চল্লিশ জন আবাদাল সব সময় বিরাজ করে থাকেন। পৃথিবীর লোকজনেরা মোটেই এদের নেই। একজন আবদালের মৃত্যু হলে সেখানে অন্য আবদাল এসে হাজির হন। সংসার কিংবা সমাজের কাজ ও এদের করতে না হয়।

২) বেদিয়া - এরা অনেকটা যাযাবরের মতো। অবশ্য এদের নিজস্ব স্থায়ী বাড়িঘরও রয়েছে। তবে বছরের অর্ধেক সময় সাপের খেলা ও ভাল্লুক নাচিয়ে এরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। বিভিন্ন আপদ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই 'রক্ষাকবচ' হিসাবে এদের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই হাটে কিংবা গ্রামে গিয়ে তাবিজ ও চোলনা বিক্রি করে। বেদিয়া শব্দটা বৈদ্য কবিরাজ ও হাকিম অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

17 AUG 1987 - 95954

বিখ্যাত মুসলমান লুকমান হাকিম বেদিয়া ছিলেন। কাটাগরী শ্রেণীর মুসলমান ও গাছ গাছড়ার ওষুধ বিক্রি করে। এরা শেখ সম্প্রদায়ভুক্ত। বেলদার - এই নামটা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। হিন্দু বেলদার মুসোহর বা রিখিয়াসন নামে অধিক পরিচিত। কোদাল দিয়ে মাটি কাটার কাজে এরা খুব পটু। জমির সীমানায় আল দেওয়া, মাটির দেওয়াল তোলা এই সম্প্রদায়ের লোকদের প্রধান কাজ। শহর এলাকায় মুসলমান বেলদাররা কবর খনন করে থাকে। এর জন্য এরা যা পারিশ্রমিক পায় সেটা দিয়ে নিজেদের সংসার নির্বাহ করে। কোন কোন এলাকায় এদেরকে মাজরাবী মুসলমান বলা হয়। আব্দুল কালাম মদনীর অনুসরনকারীরা এই নামে পরিচিত। এরা একটা ছোট ঘর তৈরী করে সেখানে মাটির ঘোড়া রাখে আর রোজ সন্ধ্যা-বাতি দেয়। কেউ কেউ একে বাছড়াপুজো বলে উল্লেখ করেন।

ভাট - ভাড় থেকে ভাট শব্দ এসেছে বলে মনে হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বরচিত কবিতা ও ছড়া শুনিয়ে এক সময় রাজা জমিদারদের আনন্দ দান করত। কারো বাড়ীর নবজাতক পুত্র সন্তান হলে ভাটেরা সেই বাড়ীতে গিয়ে শিশু কোলে নিয়ে নাচে ও গান গায়। ভাটের স্ত্রী ভাটুনিয়া কিংবা তার মেয়েরা একই ধরনের কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। বিহার রাজ্যে পাখাড়িয়া বা পাওয়ারিয়া সম্প্রদায়ের লোককে ভাট বলে। এরা ঢোলক বা ডুগি বাজিয়ে গীত গায়। এদের নামের শেষে মিঞা, খলিফা ও আলি যোগ করা থাকে। পরনে থাকে ঘাগরি আর মাথায় পাগড়ি। বিহার রাজ্যের সীমান্তবর্তী পশ্চিম বাংলায় পাওয়ারিয়া ও ভাট দুটো একেবারে আলাদা সম্প্রদায়। এখানকার ভাটের উপাধি রায়। বর্তমানে ভাটেরা ছাতা মেরামত ও কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে। দু থেকে আট বছরের যে সব ছেলে কথা বলতে পারে না বাবা-মা ভাটের সঙ্গে এক থালায় বসিয়ে তাদের খাওয়ায়। এটা একটা লোক বিশ্বাস। এখানকার নিম্নশ্রেণীর জনসাধারনের মনে করে যে, ভাটের সঙ্গে খেলে শিশু খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে। হিজড়া সম্প্রদায়ের পেশাও অনেকটা ভাট আর পাওয়ারিয়ার মতো। তবে হিজড়ারা অত্যন্ত নির্ভীক ও সাহসী। হাটে গিয়ে এরা বিক্রেতার ডালি থেকে চাল, ডাল, আটা, শাক-সব্জী ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য জোর করে তুলে নেয়। শহরাঞ্চলে রাস্তার পাশে বসে ঢোলক ও হারমোনিয়ম বাজিয়ে এরা 'কাওয়ালি' গেয়ে থাকে।

ভাটিয়া - 'ভাটি' থেকে ভাটিয়া শব্দের উদ্ভব। উজান-ভাটি কথাটা আমরা বরাবরই শুনে থাকি। এটা ইংরেজী শব্দ up এবং down এর মতো। দক্ষিন দিকে অবস্থিত এলাকাগুলোকে ভাটি বলা হয়। আর সেই এলাকার অধিবাসী ভাটিয়া নামে পরিচিত। পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলার শেরশাহ্বাদ বা বাদিয়া সম্প্রদায়কে ভাটিয়া বলা হয়। কারন তারা ভাটি এলাকা মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে। অনেকে মনে করেন ভাটিয়ারা বাংলাদেশের লোক। 'বাংলাদেশে এঁদের দেখা যায়। বাংলা দেশ থেকে অনেক ভাটিয়ারা বিহারের কাটিহার পুর্নিয়াতে প্রবেশ করেছে। ডাকাতি, লুটপাট ইত্যাদি কাজে ওরা অত্যন্ত পটু। এরা দুর্দান্ত প্রকৃতির'। (১১)

শেরশাহবাদ (বাদিয়া) - আরম্ভের মরু উপত্যকার অধিবাসী এই শেরশাহ্বাদ সম্প্রদায়। তৃতীয় খলিফা ওসমান গনির সময় পারস্পরিক মুদ্ধবিগ্রহে পালিয়ে এরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের এক অংশের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটে ও নদীর তীরবর্তী দিয়াড় অঞ্চলে বসতি স্থাপনকরতে থাকে। এদের অন্য নাম বাদিয়া। ওয়াদিয়াতুন আরবী শব্দ থেকে বাদিয়া কথাটার উৎপত্তি। কারো মতে এরা ইসলাম ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে মদিনা থেকে ভারতে আসে। তারপর শেরশাহের সময় মুর্শিদাবাদ দিয়াড় অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করে। একটু অসুবিধা হলেই এরা সহজেই স্থান পরিবর্তন করতে পারে। এভাবে এই সম্প্রদায় অল্প সময়ে পশ্চিম বাংলা, বাংলা দেশ ও সীমান্তবর্তী বিহার রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সাহসী। নৌকা চালানো, চাষবাস, গরু মহিষ ছাগলেরব্যবসা ইত্যাদি কাজে বাদিয়ারা খুব পটু। তবে এরা অনেকটা কলহপ্রিয়। শেরশাহবাদ সম্প্রদায় আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা (১) বাঘেড়িয়া (২) পাহাড়িয়া ও(৩)দিয়াড়িয়া। বিহারের দুমকা জেলার অধিবাসী বাঘেড়িয়া, তিনপাহাড় এলাকার অধিবাসী পাহাড়িয়া আর শেরশাহী দিয়াড় অঞ্চলের অধিবাসী দিয়াড়িয়া নামে সুপরিচিত। এদের মধ্যে কেউ আহলেহদীস, কেউ সাফেয়ী, কেউ হানাফি কেউ বা লামজহাবী। কোরান শরিফের নির্দেশ বা ফরজকে এই সম্প্রদায় কঠোরভাবে মেনে চলে বলে কেউ কেউ এদের ওয়াহাবী বলে থাকে। শেরশাহবাদ সম্প্রদায়ের ঠিক পাশাপাশি শেখ নামে আর এক সম্প্রদায় দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করে আসছে। এদের অনেকে নিজেদের আশরাফী বলে দাবী করে। আশ্রফ শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। অবশ্য সৈয়দ সম্প্রদায়ও আশ্রফির দাবী রাখে। শেরশাহ্বাদের তুলনায় শেখ সম্প্রদায়েরসংখ্যা খুব কম।

একমাত্র মালদহ জেলায় এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা একটু বেশী । অনেকের মতে শেরশাহ্বাদ মুর্শিদাবাদ জেলার নারায়নপুর বাইশ মৌজার লোক । বর্তমানে এ জায়গাটি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত । অপর দিকে পেঁচিরা বাংলাদেশের শিবগঞ্জ থানার লোক । এরা হানফি মজহাবকে অনুসরন করে চলে । উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা ও আচরনগত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ।

সেখ - সারা পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ মুসলমান নিজেদের সেখ সম্প্রদায়ের লোক বলে দাবী করে । সুবিধার জন্য এই সম্প্রদায়কে খোট্টা ভাষাভাষী সেখ ও বঙ্গাল সেখ এই দুইভাগে ভাগ করা যায় । বঙ্গাল সেখের মধ্যে রয়েছে উত্তরবাংলার রাজবংশী মুসলমান । এরা সকলেই হানাফি মজহাবের অন্তর্ভুক্ত । তবে এদের মধ্যে কেউ বেরেলবী আবার কেউ দেওবন্দী মতের অনুসরনকারী । বঙ্গাল সেখেরা অঞ্চলগত ও ভাষাগত দিক থেকে চার শ্রেনীতে বিভক্ত যথা :- (১) উত্তরিয়া (২) পূবলিয়া (৩) পানসিয়া ও (৪) দক্ষিনুড়িয়া । অন্যদিকে খোট্টা ভাষাভাষী সেখেরাও ধুনিয়া, কুঁজড়া, দ্বারবন্দীয়, পাঁকড়া, সবজী, জোলা, মোমার, পশ্চিমা, মুকেরী ইত্যাদি অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ।

সৈয়দ :- সৈয়দ শব্দের অর্থ নেতা । এই সম্প্রদায় হজরত মহম্মদের বংশধর বলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে । মুসলমানদের মধ্যে ফকির, সাঁই, মির এরা নিজেদের সৈয়দ হিসাবে পরিচয় দেয় । সাঁই সম্প্রদায়ের পেশা ভিক্ষা করা । অনেকে এদের ফকির সাহেব বলে থাকে । দোওয়া, তাবিজ ঝাড় ফুঁক ইত্যাদির মাধ্যমে ফকির সাহেব সবরকম অমঙ্গল ও বিপদকে দূর করার চেষ্টা করে থাকেন । তাছাড়া মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যানের জন্য সাঁই বা ফকির সাহেব পবিত্র কোরান শরিফ পাঠ করেন । সাঁই বা ফকিরের সেবা করা ও তাদের আওয়ানো মুসলমানদের কাছে অতি পূন্যের কাজ । ফকির মিসকিনদের খেতুরা বা দান করা প্রত্যেক ধনী মুসলমানদের কর্তব্য । সাঁই বা ফকির সম্প্রদায় পীরদরবেশের অত্যন্ত ভক্ত । বিভিন্ন দরগাহ্ বা পীরের আস্তানায় ওরুসের সময় এই সম্প্রদায়ের লোককে ব্যাপকভাবে দেখা যায় । সাঁই বা ফকির হওয়ার আগে তিন বেলা নিজের জ্ঞাতি বা সম্প্রদায়কে খাওয়াতে হয় । তারপর মাথা নেড়া করে বাইশ হাতের সাদা কাপড় পরতে হয় । পীর তাকে কাফা পড়িয়ে হাতে ভিক্ষার ঝোলা প্রদান করেন । ঐ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাকে দু'চার-দশ ঘর থেকে ভিক্ষা করে পীরের কাছে এনে দিতে হয় । এরপর পীরসাহেব তাকে সাত দিন পর্য্যন্ত একটা নিরালা ঘরে রাখেন । এই সময়ের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখা কিংবা তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা

করা একেবারে নিষিদ্ধ। সাতদিনের দিন গোসল করিয়ে পীর সাহেব তাকে বিদায় করেন। সাঁই সম্প্রদায় আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, (১) জালালী (২) মাদারী (৩) রাফায়ী ও (৪) বানুয়া। ভিক্ষা করার সময় সাঁই বা ফকির সম্প্রদায় গেরস্তের বাড়ীর দরজায় গিয়ে জিকির ছাড়ে ও সওয়াল করে। এই সময় এরা নানা ধরনের গজল, কাওয়ালি, কোরান শরিফ ও হদীশ সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক গান গায়। এগুলো সাঁইয়ের গীত বা ফকিরালী গীত নামে সুপরিচিত। কেউ কেউ একে জিকির গান কিংবা কলিমা গানও বলে থাকেন।

মির' শব্দের অর্থ জিতে নেওয়া বা জয়ী হওয়া। আগেকার দিনে কড়ি খেলার সময় মির, দোহান, তেহান শব্দ প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি সংখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত হত। মির সম্প্রদায়ের লোকেরা চাষবাসের কাজ খুব কম করে। এদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশ ভাল। অনেকে এদের মিঞা সাহেব নামেও অভিহিত করেন। অবশ্য কোথাও কোথাও অবস্থা সম্পন্ন মুসলমানকে মিঞা বলা হয়। এদের উপাধি চৌধুরী। মীর্জা সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরাও মিঞা নামে পরিচিত। তবে এরা সেখ সম্প্রদায়ভুক্ত। সৈয়দ সম্প্রদায়ে মধ্যে বিবাহের সময় পন প্রথার রেওয়াজ একেবারেই নেই। তাছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো ঢোলবাজনারও প্রচলন দেখা যায় না। খুব সম্ভবতঃ সৈয়দ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরা কাবুল কান্দাহার থেকে প্রথমে এ দেশে আসেন।

পাঠান:- আগেই আমরা জেনেছি পূর্ব আফগানিস্থানের পশতো ভাষী ওয়াজিরি আফ্রিদি ইত্যাদি কাবুল উপত্যকার কাফিরজনভুক্ত উপজাতি পাঠান নামে পরিচিত। আমাদের পশ্চিম বাংলায় তিন ধরনের পাঠান দেখা যায় যথা: (১) পাঠান (২) সংমিশ্রিত পাঠান ও (৩) সরকার প্রদত্ত উপাধিকারী পাঠান। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নামের শেষে খাঁন বা খাঁ উপাধি যোগ করে থাকেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী আসল পাঠান সম্প্রদায় খুব কমই রয়েছে। এদের ভাষা অনেকটা উর্দু ধরনের। এরা সকলে হানাফি মজহাবকে মেনে চলে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সবে বরাত পর্ব খুব জাকজমক ও আড়ম্বর পূর্ণ ভাবে করে থাকে। এই উপলক্ষে পাঠান মেয়েদের মিনাবাজার' উল্লেখযোগ্য। গ্রামের কোন একটি বাড়ীর ভিতর লম্বা-চওড়া আঙিনায় মিনাবাজার বসে। স্থানীয় ভাষায় এটার নাম 'হাট লাগি'। এখানে এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা নানা ধরনের হালুয়া ডিমের চপ্, ডিমের মামলেট সিঙাড়া, পাঁপড়ভাজা বেশ চড়া দরে বিক্রি করে। এরা প্রায় পঞ্চাশ রকমের হালুয়া

তৈরী করতে জানে। পাঠানের মেয়েরা পর্দানশীন। শেখ সম্প্রদায়ের ছেলে পাঠানের মেয়েকে কিংবা পাঠানের ছেলে শেখের মেয়েকে বিয়ে করে সংমিশ্রিত পাঠান নামে আর একটি শ্রেনীর উদ্ভব হয়েছে। ঠিক এইভাবে শেখ, সৈয়দ পাঠান তিন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে। খোট্টা জমাজমী এলাকায় এ ধরনের পাঠানকে খোসমুড়ি বা নকল পাঠান বলা হয়। আবার অনেক নিম্ন শ্রেনীর মুসলমান সম্প্রদায় নিজের ইচ্ছামতো খাঁ' উপাধি যোগ করে নিজেকে পাঠান বলে পরিচয় দিয়েছে। এরা কোন কোন এলাকায় মুকেরী পাঠান নামে পরিচিত। এছাড়া ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বিভিন্ন উপাধি প্রদান ও তাদের বিভিন্ন পদে বহালের নজির মুসলমান যুগে যে পাওয়া যায় না তা নয়। খাঁ বা খাঁন উপাধিধারীর বংশধর পরবর্তীকালে পাঠান সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় মোগল সম্প্রদায়কে দেখা যায় না। আমাদের দেশের মোগল সরাই নামক জায়গার অধিবাসী মোগল নামে পরিচিত। এদের পেশা হিং বিক্রি করা। এরা হিং বিক্রির জন্য সময় সময় বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

জোলা :- জোলা সম্প্রদায় তাঁতের কাপড়, গামছা, লুঙ্গি তৈরী করে থাকে। মুসলমানেরা এদের মোমিন নামে অভিহিত করে থাকে। মোমিন আরবী শব্দ। এর অর্থ বিশ্বাসী। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা আবার তিন শ্রেনীতে বিভক্ত যথা :- (১) দেশী মোমিন (২) গোট্টিয় মোমিন বা পশ্চিমা মোমিন ও (৩) সাঁওতালিয়া মোমিন। দেশী মোমিন আর সাঁওতালিয়া মোমিন কাপড় বুনে কিন্তু গোট্টিয় মোমিন কাপড় বুনে না তবে কাপড়ের ব্যবসা করে। পশ্চিমা মোমিনকে গোট্টিয় না বলে গইরিও মোমিন বলাটাই যুক্তিসঙ্গত। গইর উর্দু' শব্দ এর অর্থ ভিন্ন দেশীয় বা বিদেশীয়। দেশী মোমিন নিজেদের নামের শেষে মোমিন উপাধি যোগ করে থাকে অথচ গোট্টিয় মোমিন নিজেদের নামের শেষে আনসারী লেখে। এরা নিজেদের মদিনার আইয়ুব আনসারীর বংশধর বলে দাবী করে। আনসারি শব্দের অর্থ সাহায্যকারী। হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় গেলে আনসারেরা তাঁকে সাহায্য করেছিল। গোট্টিয় মোমিন দেশী মোমিন অপেক্ষা শিক্ষিত। এদের মেয়েরা পর্দানশীন। তবে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান দেখে মনে হয় পশ্চিম বাংলার মুসলমান জোলা সম্প্রদায়ের সকলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান।

খোন্দাকার :- খোন্দাকার মুসলমান সম্প্রদায় কৃষিকার্য্যের কাজ করে না। এদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ভাল। চাকুরী ও ব্যবসার মাধ্যমে এরা নিজেদের জীবিকা

নির্বাহ করে। 'ওহদ যুদ্ধের অভিজ্ঞ তার পর হজরত এইবার মদিনার বাহিরে গেলেন না। তাঁহার আদেশ অনুসারে মদিনা অরক্ষিত লোকালয়ের চতুর্দিকে একটি পরিখা খনন করা হইল। এইজন্য ইহাকে খন্দকের যুদ্ধ বা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। হজরত নিজ হস্তে ও অন্যান্য মুসলিম দিগের সহিত পরিখা খনন করেন। (২০) মনে হয় উক্ত পরিখা বা খন্দক খননকারীদের বংশধরেরা পশ্চিমবাংলায় খন্দকার নামে পরিচিত।

ধীবর (কেউট) :- ধীবর (কেউট) সম্প্রদায়ের লোকেরা নদীর ধারে বসবাস করে। তাদের পেশা মাছ ধরা ও মাছ বিক্রি করা। এলাকা বিশেষে এরা তিয়ড়, ধেঁওড়, কেউট ও পাঁকড়া নামে পরিচিত। এদের চালচলন ও আচার ব্যবহার দেখে মনে হয় হয় এরা নিম্ন শ্রেণীভুক্ত। আর এক শ্রেণীর মুসলমান জেলের সন্ধান পাওয়া যায় তারা হল বানি ইসরাইল সম্প্রদায়। মদিনা ও দামেস্কের মধ্যে নদীর তীরবর্তী আয়লা নামক গ্রামে ছিল এদের বসতি। তাদের পেশা ছিল মাছ ধরা ও মাছ বিক্রি করা। 'পুরানো" আহাদনামা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে হজরত ঈশা (আ:) এর জন্মের ১০১৫ বৎসর পূর্বে সোলেমান এর জাহাজ 'কুলজুম' নামক সমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষ পর্যন্ত আগমন করিত"। (২১) 'যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর মৃত প্রায় লক্ষিত হইলে ইহুদীগন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। তিনি চলৎশক্তি প্রাপ্ত হইলেই স্বীয় শিষ্যসহ (তন্মধ্যে মৎস্য ব্যবসায়ী ইসরাইলও ছিল) আফগানিস্থানের পার্বত্য প্রদেশ দিয়া কাশ্মীরের উপত্যকায় উপনীত হন। আফগানিস্থান ও কাশ্মীরের অনেক লোক বনিইসরাইল দাবী করে ও স্বীকৃত হয়।' (২২) মাল্লাহ্ সম্প্রদায়ও নৌকাযোগে মাছ ধরা ও মাছবিক্রির কাজ করে থাকে। তবে এদের সংখ্যা আমাদের পশ্চিম বাংলা থেকে বাংলা দেশে অনেক বেশী।

দর্জি :- এরা সূঁচসুতা দিয়ে হাতের সাহায্যে নানা ধরনের কাপড়, সামিয়ানা সেলাইকরে। চিত্রাঙ্কন বা নক্সার কাজে এরা খুব পটু। সামিয়ানার সুন্দর চিত্র দেখলে আমাদের মুগ্ধ হতে হয়। বর্তমানে সেলাই মেশিনের আবির্ভাবে গ্রাম্য চিত্র শিল্পীরা হাতের সেলাই বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এরা খলিফা নামে পরিচিত। মুসলমান দর্জির আর এক নাম ইদ্রিশিয়া। এই ইদ্রিশিয়া সম্প্রদায় নিজেদের ইদ্রিশ নবীর বংশধর বলে দাবী করে।

মুসলমানভাটেরাও ইদ্রিশিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হবার দাবী রাখে। তবে

আজকের দিনে অনেকে দর্জির কাজ বা কাপড় সেলাইয়ের কাজে হাত দিয়েছে। কারন এই কাজে ভাল পয়সা রোজগার হয়। তা বলে এরা সবাই ইদ্রিশিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। বর্তমানে দর্জিরা খলিফার পরিবর্তে মাস্টার নামে পরিচিত।

কাজী :- বিচারক অর্থে আমরা কাজী শব্দটাকে ব্যবহার করে থাকি। যাঁরা বিভিন্ন যুক্তি ও নিজের বিবেকের দ্বারা উচিৎ বিচার বা কোন কিছুর মীমাংসা করেন তাঁরাই হলেন কাজী। কিন্তু কাজী শব্দ বিচারক শব্দের চেয়ে অনেকটা সঙ্কীর্ণ অর্থ বহন করে। কারন ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক যিনি বিচার কার্য্য পরিচালনা করেন তিনিই প্রকৃত কাজী নামের অধিকারী তাদের কাজীর বংশধরেরা পৃথকভাবে কাজী সম্প্রদায় গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। কাজীর মধ্যে আবার তিনটি ভাগ লক্ষ্য করা যায় যথা, (১) মুফতি (২) রেজেস্ট্রী বিবাহের কাজী ও (৩) বাদশাহ্ জমিদারদের অধীনস্থ বিচার কার্য্য পরিচালনার কাজী। ইসলামের সমস্যাজড়িত বিষয়ের ফতোয়া প্রদান করেন মুফতি।

সবজি ফরাস :- এই সম্প্রদায় স্থান বিশেষে 'কুঁজরা' নামে পরিচিত। এরা শাকসব্জী গ্রাম থেকে কিনে নিয়ে হাটে বাজারে বিক্রি করে। পুরুষ ও মেয়েলোক উভয়েই মাথায় শাকসব্জীর ঝুড়ি নিয়ে হাটে যায়। অবশ্য এরা শাক সব্জীর চাষও করে থাকে। আর এক শ্রেনীর মুসলমান আছে যারা বাকালি ও বাখো নামে পরিচিত। এরাও সব্জী ফরাসের মত গ্রামে গ্রামে মরিচ পেঁয়াজ, আলু বেগুন ইত্যাদি শাকসব্জী বিক্রি করে। অবশ্য বাখোরা দাঁতের মিশি, চোখের সুরমা ও পাচক তৈরীর কাজ করে থাকে।

ধুনিয়া বা ধুনুরী :- এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তুলা ধুনার কাজ করে। লেপ ও তোষকে তুলা ভরা ও সেলাই করা এদের পেশা। এদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম। এরা জোলা বা মুসলমান তাঁতির একটা অংশ হিসাবে নিজেদের মনে করে। এদের উপাধি নাদাব।

দাই :- অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের ছোট বা নিম্ন শ্রেনীর মুসলমান হিসাবে গন্য করে। অথচ এরা নিজেদের আরব দেশের খ্যাতনাম্নী হালিমা দাই এর বংশধর বলে দাবী করে থাকে। আগেকার দিনে দাইয়ের ঘরে শিশু লালিতপালিত হত। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যের বাড়ীতে দিন মজুরের কাজ করে আর মেয়েলোকেরা ধনী বা অবস্থাসম্পন্ন লোকের বাড়ীতে রান্নাবান্না, থালা -

বাসন মাজা ও ঘর ঝাড় দেওয়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। কোন কোন এলাকার দাইয়েরা মাটির হাড়ি ও কলসী বিক্রি করে।

ভূঁইয়া :- যারা ভূঁই বা জমির মালিক তাদের ভূঁইয়া বলে। ভূঁইয়ারা অনেকটা জমিদারদের মত প্রতাপশালী। ঈসা খাঁ মসনদ আলী পূর্ববঙ্গের বার ভূঁইয়াদের অন্যতম। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের রচিত আকবর নামায় একজন প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া বলিয়া ঈসা খাঁর উল্লেখ আছে। তাহার পিতা কালিদাস গজদানী ছিলেন রাজপুত। তিনি ইসলাম ধর্মগ্রহন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোর গঞ্জের সন্নিকটে xxxxx হয়রতনগর ও জঙ্গলবাড়ী তে ঈসা খাঁর বংশধরগন এখনও বর্তমান।(২৩)

কালাল :- কালালেরা নামের আগে সেখ লেখে। এরা হানাফি মজহাবের অনুসরনকারী। এরা ইসলামী শরিয়তকে মেনে চলে তবে পেশাটা শরিয়ত বহির্ভূত। কারন এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নেশা ও মাদকদ্রব্য গাঁজা, আফিম ও মদ বিক্রি করে নিজেদের সংসার চালায়। স্থায়ী ভাবে এদের গাঁজা ও মদের দোকান রয়েছে। নামের শেষে এরা মিঞা লেখে। এদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকলেও শিক্ষায় অনেকটা অনুন্নত।

হাজাম :- যারা চুল কাটে ও দাড়ি কামায় তাদের হাজাম বা নাপিত বলে। তবে মুসলমান হাজামxপ্রক স্থান বিশেষে "মুন্সিতিয়া নাউয়া" নামেও অভিহিত করা হয়। এরা সাত থেকে দশ বছরের ছেলেদের খাৎনা বা ত্বকছেদ করে থাকে। "ছেলের বয়স যখন ৭।৮ বা ৯।১০ বৎসর হইবে তখন তাহারা খাৎনা করাইতে হইবে। খাৎনা করান শুধু একটা প্রথা মাত্রই নয়। ইহা ইসলাম ধর্মের বড় একটি সুন্নত। হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস্সালামের উপর আল্লাহর হইতে ১০টি সুন্নত পালন করার জন্য ওহী আসিয়াছিল তম্মধ্যে খাৎনা একটি।খাৎনা করার সময় অনেকে অনেক রকম আড়ম্বর করিয়া থাকে, শরীয়তে উহার কোন হুকুম নাই।(২৪)

প্রতিটি হাজামের এলাকা ভাগ করা থাকে। অনেকসময় এলাকা ছোট কিংবা বড় ও হতে পারে। বর্তমানে শিক্ষার প্রসারের ফলে অভিজ্ঞ ডাক্তারকে দিয়ে খাৎনার কাজ করানো হয়।

নাট :- নাট সম্প্রদায়েরা লোকের ঢোল বা ঢোলক বাজিয়ে আলহ্-উদলার গীত গায় ও পয়সা রোজগার করে। পশ্চিমবাংলা থেকে বিহারে এদের সংখ্যা অনেক বেশী। বেদিয়ার মতো এরাও সাপ-ভালুকের খেলা দেখিয়ে থাকে। ইন্দ্রজালিক বিদ্যায়

নাটেরা খুব পারদর্শী ।   গাইন :- গাইন শব্দের অর্থ গায়ক । তবে সব গায়কের গাইন বলা চলে না । যারা কাওয়ালি গায় তাদের আমরা 'কাওয়ালি' বলি। মুসলমানদের মধ্যে যারা সত্যপীরের গান বা পাঁচালি গায় তারা গাইন নামে পরিচিত । আর এমনি ভাবে গাইন সম্প্রদায়ের উদ্ভব । বর্মান ও রাজবংশী মুসলমানের মধ্যে এদের বেশী সংখ্যায় দেখা যায় ।

চুরিহরা :- চুড়ি বিক্রির যারা কাজ করে তারাই চুরিহরা । আজকাল অবশ্য অনেকে মনোহারীর দোকান দিয়ে চুড়ি, আলতা, ফিতা, স্নো ইত্যাদি বিক্রি করে থাকে । তাদের আমরা চুরিহরা বলতে পারি না । এই সম্প্রদায়ের লোকেরা একমাত্র চুড়ি বিক্রি ছাড়া অন্য কাজ করে না । মাথায় চুড়িরডালি নিয়ে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কিংবা পৃথকভাবে গ্রামে হাটে কিংবা মেলাতে যায় ও চুড়ি বিক্রি করে । বর্তমানে বেশীর ভাগ মেয়েরা শহরে গিয়ে নিজেদের পছন্দমত ও কমদামে চুড়ি কিনতে পারে বলে চুরিহারারপেশা বন্ধ হতে চলেছে । চুরিহরারা মুসলমান-হিন্দু উভয় সমাজে নিজেদের স্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে । বিয়ের অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন উৎসব-পার্বনে পাড়াগ্রামে আজও চুরিহরার কদর লক্ষ্য করা যায় । পেশা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখে এরা আজকাল গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি চামড়ার ব্যবসা আরম্ভ করতে বাধ্য হয়েছে । মুসলমান মুচি সম্প্রদায়ও চামড়ার ব্যবসা করে তবে তাদের প্রধান পেশা হল জুতা তৈরী করে বিক্রি করা ।

লাহেরী :- লাহা বা লাক্ষা তৈরীর কাজ যারা করে তারা হল লাহেরী । কীট বা পোকা থেকে লাক্ষা হয় । এটাকে লাক্ষা কীটও বলা হয় । কুল গাছের ডালে কীট গুলোকে রাখা হয় । এই গাছের পাতা খেয়ে পোকা গুলো যে আঠা জাতীয় রস বের করে সেটাই লাহা বা লাক্ষা নামে পরিচিত । এলাকা বিশেষে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা চুড়ি বিক্রির কাজও করে থাকে ।

পাটেয়া :- পাটেয়াদের সংখ্যা বিহারে অনেক বেশী নিজেদের সম্প্রদায়গত পেশা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে এরা কেউ কেউ মনোহারীর দোকান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে । যারা সুতো দিয়ে মেয়েদের চুল বা খোঁপা বাধার ফিতা তৈরী করে তাদের বিহার এলাকায় পাটেয়া বলে । আর ঐ সুতোর ফিতেটাকে পশ্চিমবাংলার খোট্টা সম্প্রদায় নারা ফুদনা' বলে জানে । এখানকার পটুয়া

সম্প্রদায় বিহারের পাটেয়া হয়তো এক ও অভিন্ন। পেশা পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে আর পটচিত্র ও পট সঙ্গীতের কোন চর্চা লক্ষ্য করা যায় না। পটুয়াদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক রয়েছে। গাজীর পটে ইসলাম ধর্মের কাহিনী ও হজরতের জীবনী প্রবেশ লাভ করেছে। পটুয়ারা সম্ভবতঃ এককালে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছিল। এরা সকলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান।

এছাড়া কান বা কানু সম্প্রদায় পালকী বহন করে। এক সময় পালকী ও গরুর গাড়ী ছিল প্রধান যানবাহন। বাদশা জমিদার বা তাঁদের মেয়েরা একমাত্র পাল্কীতে করেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত। মুসলমানদের বিয়ের গীত থেকে জানা যায় যে আগেকার দিনে বিয়ে উপলক্ষে ডুলি বা পালকী ব্যবহৃত হত। এই কান বা কানু সম্প্রদায় কোথাও কোথাও কাহারিয়া বা বেহারা নামে পরিচিত। মুসলমানেরা শরিয়তের দিক থেকে এক ও অভিন্ন হলেও পেশা কিংবা আচার ভিত্তিক অনেকগুলো বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। এককালে নিজস্ব শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এমনকি শরিয়ত বহির্ভূত তাদের পৃথক পৃথক উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠান আজও বর্তমান। যা অনেকটা হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ না হলেও খুড়তুতো, জাঠতুতো, মামাতুতো, পিসতুতো ভিন্ন ভাইবোনের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এবং এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়। ডঃ আতুলসুরের মতে এরূপ বিবাহে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় ও সম্পত্তি অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। [২৫]

মুসলমানের নামের আগে বা শেষে যেগুলো উপাধি যোগ করা থাকে তা মূলত: স্থান, বংশ, পেশা ও পুরুষত্ব। বসবাসের এলাকা হিসাবে কেউ মেদিনী, কেউ নদবি আবার কেউ চিশতি নামে পরিচিত। বংশগত দিক দিয়ে কোরেইশী নামাফিল, উমাবি, আনসুরি, ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। কাজী, মোল্লা জওহরী প্রভৃতি উপাধি পেশা ভিত্তিক। আবার সিদ্দিক(সত্যবাদী), সুফি, খাজা ইত্যাদি নামটা পুরুষত্ব। পেশাকে বাদ দিয়ে আচার ভিত্তিক ভাগ করলে ভাগের সংখ্যা অনেকটা কমে যাবে সন্দেহ নেই। এই হিসাবে আমরা (১) দ্বারবর্তী য় (২) শেরশাহবাদ (৩) পাঠান (৪) সাঁই ও (৫) বঙ্গীল (রাজবংশী মুসলমান) এই পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। আসলে এটাকে মোট তিনভাগে ভাগ করে দেখলে কোন ঝামেলাই থাকে না এগুলো হল (১) খোট্টা (সংমিশ্রিত)

ভাষাভাষী মুসলমান (২) শেরশাহবাদ ও (৩) বঁদান বা রাজবংশী মুসলমান।

উপরি-উক্ত সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ই উত্তরবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকার অধিবাসী। পেশাগত বিভেদ ও আচার-আচরণগত কিছুটা পার্থক্য সত্ত্বেও মূল লোকসংস্কৃতির জগতের উৎস- গানা -লোকনাট্য - লোকগীতিকায় কিছু কোন বিভাজন নেই - একথা আমরা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করবো।

পাদটীকা :

(১) ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক - দীন ইসলাম - ১ম খণ্ড - (১ম সং) - পৃ: - ১০

(২) মৌলবী আজহার আলি - হজরত জড় পীরের জীবনী - (১ম সং) - পৃ: - ৪

(৩) হজরত মৌলানা আশরাফ আলী থানভি (রা:) - বেহেশ্তী জেওর - অনুবাদক মাওলানা শামসুল হক - (৪-৭ খণ্ড) - ৩য় মুদ্রন ঢাকা (১৯৭৩) পৃ: - ২৯৮

(৪) ভারতকোষ - ১ম খণ্ড - (১ম সং) পৃ: - ৫৩৪

(৫) সৈয়দ আব্দুর রউফ আল্ হোসায়নী - জ্ঞানের আলো - ১ম খণ্ড - (১ম সং) ১৯৭৩ - পৃ: - ১২৭

(৬) ভারতকোষ - ১ম খণ্ড - (১ম সং) - পৃ: - ৪০৭

(৭) ভারত কোষ - ১ম খণ্ড (১ম সং) - পৃ: - ৩৭২

(৮) মুহম্মদ এনামুল হক - বঙ্গে সুফী প্রভাব - ১ম সং (১৯৩৫) পৃ: - ১৩৭ - ১৩৮

(৯) মুহম্মদ এনামুল হক - তদেব - ১ম সং (১৯৩৫) পৃ: - ১৩৯

(১০) ভারতকোষ - ১ম খণ্ড - (১ম সং) - পৃ: - ৫১৭

(১১) সৈয়দ আব্দুর রউফ আল্ হোসায়নী - জ্ঞানের আলো - ১ম খণ্ড (১ম সং) ১৯৭৩ - পৃ: - ৯৩

(১২) রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস - ২য় খণ্ড - ২য় সং (১৩৮০) পৃ: - ২৩৭

(১৩) মোহম্মদ ইয়াকুব আলী - মুসলমানদের জাতিভেদ - ১ম সং - পৃ: - ১

(১৪) ঐ ঐ - পৃ: - ৫৯

(১৫) রমেশচন্দ্র মজুমদার - তদেব - পৃ: - ২৩৭

(১৬) রমেশ চন্দ্র মজুমদার - তদেব - পৃ: - ২৩৬

পাদটীকা :

(১৭) ভারত কোষ - ১ম খণ্ড - (১ম সং) - পৃ : - ২৬০

(১৮) শ্রী কালীপদ লাহিড়ী - গৌড় ও পাণ্ডুয়া - ১ম সং (১৩৬৭) পৃ : - ৩৪

(১৯) যুগান্তর পত্রিকার রিপোর্ট' - ১৯. ৪. ৮৩ পৃ : - ৪

(২০) আব্দুল ওয়াহাব মাহমুদ - ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস - ১ম সং - পৃ : - ৫৭

(২১) মহাম্মদ আব্দুল গনি - রহীম বনি ইসরাইলের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত - ১ম সং - পৃঃ - ১৮

(২২) মহম্মদ আব্দুল গনি - ঐ - পৃঃ - ৩২

(২৩) ভারত কোষ - ১ম খণ্ড - ১ম সং - পৃ : - ৫৩২

(২৪) হজরত মৌলানা আশরাফ আলী থানবি - বেহেশতি জেওর - অনুবাদক - মাওলানা
শামসুল হক (৪-৯খণ্ড) - ৩য় মুদ্রণ ঢাকা,
(১৯৭৩) - পৃ : ২১৮

(২৫) ড : আবুল মনসুর - ভারতের বিবাহের ইতিহাস - ১ম সং (১৩৮০) পৃঃ - ১১৯